মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ এবং সে সময়কার পরিপ্রেক্ষিত

সঞ্চারণ
ঐতিহ্যের অনুরণন

সৈয়দ আলী আহসান

উনবিংশ শতকের ষষ্ঠ-সপ্তম দশকে আমাদের দেশে ইংরেজরা ফরায়েজী এবং ওয়াহাবী ধর্মীয়-রাজনৈতিক আন্দোলন কঠোরভাবে দমন করতে থাকে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে খ্রিস্টান যাজক শ্রেণীর লোকেরা এদেশে এসেছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল খ্রিস্ট ধর্মের প্রচার। কিন্তু ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী যাজক সম্প্রদায়ের ধর্ম প্রচারকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে থাকে। শাসকের আক্রমণ প্রধানত পড়েছিল মুসলমানদের উপর। তার ফলে দীর্ঘকাল পর্যন্ত বাংলাদেশের মুসলমানদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে। বাংলাদেশে ইংরেজ রাজত্ব শুরু হবার পরে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মুসলমানের মধ্যেও তা অনুপ্রবিষ্ট হতে থাকে। এ সময়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার কিছু মুসলমান খ্রিস্টান হতে থাকে। অশিক্ষা, নিজ ধর্মের প্রতি শিথিল বিশ্বাস এবং আর্থিক ও সাংসারিক মোহই স্বধর্ম ত্যাগ করে তদানীন্তন রাজধর্ম গ্রহণে সেদিন মুসলমানদেরও প্রেরণা যুগিয়েছিল।

হিন্দু সমাজকে শতাব্দীর শুরুতে এ ধরনের খ্রিস্টান ধর্ম-মুখিতা থেকে বাঁচিয়েছিলেন রামমোহন। শতাব্দী শেষে মুসলমানদের মধ্যে আন্দোলন আরম্ভ করেন যশোর নিবাসী বাগ্মীপ্রবর মুন্সী মেহেরুল্লাহ এবং তারই হাতে দীক্ষিত মুন্সী মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন। এঁদের প্রধান অবলম্বন ছিল ওয়াজ। গ্রামে গ্রামে জেলায় জেলায় বক্তৃতা করে মুন্সী মেহেরুল্লাহ আশাতীত ফল লাভ করেছিলেন।

বাঙ্গালী মুসলিম সমাজকে রক্ষা করার ব্যাপারে মুন্সী মেহেরুল্লাহর দান অবশ্য অশেষ, কিন্তু তিনি এবং তার অনুগামী জমিরুদ্দীন সংঘবদ্ধ হয়েও সেদিন মুসলিম সমাজের মধ্যে চেতনা সৃষ্টি করতে পারেননি। এঁদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এ যুগের বাঙালী মুসলমানদেরকে ইসলামমুখী করে তুলেছিল একটি বিশেষ দল। সে দলটিকে সুধাকর দল আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

এঁদের মধ্যে প্রধান খুলনা জেলার সাতক্ষীরার অন্তর্গত বাঁশদহের অধিবাসী এবং কলকাতা ডভটন ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের আরবী ও ফারসীর অধ্যাপক মৌলবী মেয়রাজউদ্দীন আহমদ, ময়মনসিংহের টাঙ্গাইলের অন্তর্গত চাড়ানের অধিবাসী এবং কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার বাংলা ও সংস্কৃতের অধ্যাপক পণ্ডিত রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদী, বশিরহাটের মোহাম্মদপুর নিবাসী মুন্সী শেখ আবদুর রহিম এবং ত্রিপুরা জেলার রূপসার অধিবাসী মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ।

আর্থিক ও সাংসারিক প্রলোভনে পড়ে কোনও কোনও ক্ষেত্র বাঙালী মুসলমানেরা যে সেদিন খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিল, তা থেকে তাদের বাঁচানোর একমাত্র পথ ছিল তাদেরকে ইসলামী ঐতিহ্য এবং মুসলমানদের জাতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা। এতে সিদ্ধি লাভ করার জন্য মাতৃভাষায় জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি করে সর্বসাধারনের মধ্যে পরিবেশন করা এবং সংবাদ-পত্রাদির মাধ্যমে ধর্ম ও কৃষ্টিমূলক বিষয়বস্তুর আলোচনা করে মুসলিম জনসাধারণের দৃষ্টি ফুটিয়ে তোলাই ছিল প্রশস্ত পথ।

উল্লিখিত মনীষীবৃন্দ এ সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে কলকাতায় একটা দল বাঁধলেন এবং প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার অভাবে প্রথমত মুসলিম কৃষ্টি এবং ইসলামের তত্ত্বকথা সংক্রান্ত কতকগুলো বই-এর অনুবাদ করে খণ্ড খণ্ড আকারে প্রকাশ করতে লাগলেন। ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে সুপণ্ডিত এবং অভিজ্ঞ মনীষী জামালুদ্দীন আফগানী কর্তৃক ফারসী ভাষায় রচিত নেচার এবং নেচারিয়া নামক গ্রন্থের অনুবাদ করে এসলাম তত্ত্ব নাম দিয়ে প্রথম খণ্ড প্রকাশ করলেন। এর অল্পদিন পরেই মওলানা আব্দুল হক হাক্কানীকৃত তফসিরে হাক্কানীর উপক্রমণিকা ভাগ থেকে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিবাদক বিষয়সমূহ অনুবাদ করে এঁরাই

‘এসলাম তত্ত্ব’ দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করলেন। ‘এসলাম তত্ত্ব’ [বা মুসলমান ধর্মের সার সংগ্রহ] এর প্রথম খণ্ড ১২৯৪ সাল, আশ্বিন মাসে অর্থাৎ ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১২৯৫ সাল- ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

‘এসলাম তত্ত্ব’ খণ্ডাকারে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতো বলে অনেকেই একে মাসিক পত্রিকা মনে করতেন। এসলাম তত্ত্ব খুব বেশী দিন চলেনি। তবু এর বিক্রয়লব্ধ অর্থে এবং ময়মনসিংহ করটিয়ার জমিদার হাফেজ মাহমুদ আলী খান এবং বর্ধমানের কুসুম গ্রামের জমিদার মুন্সী মোহাম্মদ এব্রাহিমের অর্থানুকুল্যে শেখ আবদুর রহিম এবং মুন্সী মোহম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, ‘সুধাকর’ নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯২৬ সালের [১৮৮৯] আশ্বিন মাসে প্রথম সংখ্যা ‘সুধাকর’ প্রকাশিত হলো।

‘সুধাকর’ পত্রিকা নানা বিপর্যয়ের ভেতর দিয়ে বেশ কিছুদিন চলেছিল। এ পত্রিকার মাধ্যমেই বাংলা ভাষায় বাঙালী মুসলমানেরা তাদের ধর্মের মহিমা, তত্ত্ব, তথ্য, জাতীয় ঐতিহ্য ও গৌরব সম্বন্ধে কিছুটা সচেতন হয়েছিল। সেকালে বঙ্কিম প্রমুখ মুসলিম-বিরোধী লেখক মুসলমানদের বিরুদ্ধে যেসব লেখা লিখতেন, ‘সুধাকর’এ তার প্রতিবাদ বের হতো।

‘সুধাকর’ দল সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার পূর্বে আধুনিক বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি পথে বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে কেউ যে অগ্রসর হয়নি, তা নয়। এ দলের বহু আগে থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে মীর মশাররফ হোসেন বাংলা সাহিত্য সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তার আগে শামসুদ্দীন মুহম্মদ সিদ্দিকীকে দেখা যায়। তার ‘ভাবনা’র এবং ‘উচিত শ্রবণ’ ১৮৬৫ সালের আগেই রচিত ও প্রকাশিত হয়। কিন্তু বাংলায় মুসলিম জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির নেশায় এঁরা যেমন করে মেতেছিলেন এবং প্রাণঢালা সাধনা করেছিলেন, এঁদের আগে তেমন আর কাউকে দেখা যায় না। তাছাড়া এমন সচেতন জাতীয়তাবোধও তাঁদের আগের কোনও মুসলমান-রচিত সাহিত্যে এমনভাবে ফুটে ওঠেনি। এঁরা আরবী ফারসী সাহিত্য থেকে অনুবাদ করেছেন, হযরত মুহম্মদ [সঃ]-এর এবং অন্যান্য পীর-পয়গম্বরের খলিফাদের এবং তাঁর সাহাবীরা এবং ওলী আল্লাদের জীবনী লেখেছেন, ইসলাম ধর্মের গৌরব গাঁথা রচনা করেছেন, তারা মহিমা ব্যাখ্যা করেছেন।

একটি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা তার মনোজীবনের স্পন্দন এবং অন্তর ও বহির্জীবনের প্রকাশে যে তার জাতীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক এঁদের এ বোধ ছিল প্রখর। বাঙালী মুসলমান জাতির ঘোর দুর্দিনে এঁরাই সে জাতিকে ঘরমুখো করেছিলেন এবং নিজেদের চিনতে সহায়তা করেছিলেন। এক কথায় এ ‘সুধাকর’ দলই যেভাবে মুসলমানদের জাতীয় সাহিত্যের ভিত্তি রচনা করেছিলেন সে পথেই অর্ধ শতাব্দী ব্যাপী সাধনায় বাঙালী মুসলমানদের জাতীয় সাহিত্য বিকশিত হয়েছে। অন্য কথায় মুসলিম জাতি এবং এ জাতির সাংস্কৃতিক জীবনের ধারা এঁদেরই হাতে লালিত ও বর্ধিত হয়েছে। মুসলিম বাংলা সাহিত্যে ‘সুধাকর’ দলের ভূমিকা এ দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই বিচার করতে হবে। পরবর্তী মুসলিম সাহিত্যিকদের জন্য এঁরা পথ তৈরী করে দিয়ে গেছেন এবং সে কারণেই আমাদের জাতীয় জীবনেও নবীন অধ্যায় এবং বাঙালী মুসলমানের মনে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করে নব গৌরবের সূচনা করেছেন। এঁদের রচিত সাহিত্যের মূল্য যেমনই হোক না কেন, স্থান-কাল-পাত্র বিচারে বাংলা সাহিত্যে এঁদের ঐতিহাসিক ভূমিকার গুরুত্ব অপরিসীম।

মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর নাম আজকার দিনে তেমন শোনা যায় না, বাংলা সাহিত্যের ক্রমধারার মধ্যেও তাঁর গ্রন্থগুলোকে তেমন স্থান আমরা দেই না। রীতি প্রকরণের দিক থেকে যে সমস্ত রচনাকে আমরা সাহিত্য বলি সে ধরনের সাহিত্য মুন্সী মেহেরুল্লাহ রচনা করেন নি। কিন্তু তিনি যা করেছেন মুসলমানদের সামাজিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এবং ধর্মীয় শুদ্ধতার ক্ষেত্রে তা অনন্যসাধারণ। রাজা রামমোহন রায় যে অর্থে বাঙালী হিন্দু সমাজকে কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে আধুনিক জীবন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে অর্থে হিন্দু সমাজকে তার চিন্তার দৈন্যদশা থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন, মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহও তেমনি খ্রিস্টান ধর্মের আগ্রাসন থেকে বাঙালী মুসলমানকে রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি মোট দশটির মতো গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। মোটামুটি তাঁর সব কটি গ্রন্থই ইসলাম ধর্মের যথার্থ স্বরূপ উদঘাটন কল্পে রচিত। সে সময় খ্রিস্টীয় সম্প্রদায় কুরআন শরীফের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন করেছিল এবং মানুষের মুক্তির জন্য খ্রিস্টান ধর্ম যে একমাত্র ধর্ম এ ধরনের বিতর্ক উপস্থিত করেছিল। খ্রিস্টানদের সকল সমালোচনা এককভাবে খণ্ডন করেছিলেন মুন্সী মেহেরুল্লাহ। এ সমস্ত খণ্ডন প্রক্রিয়ার মধ্যে মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহকে আমরা অত্যন্ত যুক্তিবাদী এবং অসাধারণ জ্ঞানী হিসেবে আবিস্কার করি। তিনি গভীরভাবে খ্রিস্টানদের বাইবেল পাঠ করেছিলেন, হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থগুলো পাঠ করেছিলেন এবং ইসলাম কুরআন-হাদীস তাঁর আয়ত্ত্বে ছিল। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তিনি যুক্তির সাহায্যে যেভাবে খ্রিস্টানদের ধর্ম বিষয়ক নানাবিধ সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করেছিলেন তা আজকের দিনের আলোকেও অনন্য সাধারণ। সে সময় বেশ কিছু মুসলমান খ্রিস্টান যাজকদের প্রচারণায় পড়ে যীশুখ্রিস্টকে ভজনা আরম্ভ করেন। এরা শুধু খ্রিস্টান হয়েই ক্ষান্ত হননি, খ্রিস্টীয় সমাজের পক্ষে এবং মুসলমানদের বিপক্ষে কলমও ধরেছিলেন। মুসলমান নামধারী কোন ব্যক্তি খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করে যদি ইসলামের বিরুদ্ধে কিছু বলে তাহলে সাধারণ মানুষ তার উপর সহজেই বিশ্বাস স্থাপন করে, অন্তত অশিক্ষিত মানুষেরা তো করবেই।

মুন্সী মোহাম্মাদ জমিরুদ্দীন একজন শিক্ষিত মুসলমান ছিলেন। ইনি সেকালের খ্রিস্টান মিশনারীদের সংস্পর্শে আসেন। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর তিনি খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। সে সময় খ্রিস্টান পাদ্রীরা খ্রিস্টীয় “বান্ধব” নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করত। উক্ত পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালানো এবং প্রমাণ করা যে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করার মধ্যেই মুসলমানদের একমাত্র মুক্তি রয়েছে। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টীয় “বান্ধব” পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন “আসল কুরআন কোথায়?” – এই শিরোনামে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। উক্ত প্রবন্ধগুলোর মধ্যে কুরআন শরীফের সত্যতা নিয়ে ছয়টি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। প্রখর যুক্তির সাহায্যে এবং কোনোরূপ আবেগ বা ক্রোধ প্রকাশ না করে মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ “সুধাকর” পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যায় জমিরুদ্দীনের উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব দেন এবং প্রমাণ করেন যে কুরআন শরীফ যে ভাষায় ও বাকভঙ্গীতে প্রথমে নাজেল হয়েছিল অবিকল সেই ভাষা ও ভঙ্গীতে এখন পর্যন্ত বিদ্যমান আছে। কিন্তু খ্রিস্টানদের “বাইবেল” এবং ইহুদীদের “তাওরাত” বহুবার পরিবর্তিত হয়েছে এবং বর্তমানে আসল “তৌরাত” এবং “ইনজিল” যে কোথায় তা কেউ বলতে পারে না। মুন্সী মেহেরুল্লাহর প্রবন্ধটির নাম ছিল “ঈসাঈ বা খ্রিস্টানী ধোঁকা ভঞ্জন”।

মুন্সী জমিরুদ্দীন মুন্সী মেহেরুল্লাহর প্রবন্ধ পাঠ করে নিজের ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন হন। ধর্ম সংক্রান্ত বাদানুবাদে পরাজিত হয়ে তিনি খ্রিস্টান ধর্ম ত্যাগ করেন, ইসলামে ফিরে আসেন এবং ইসলাম প্রচার ও রক্ষায় মুন্সী মেহেরুল্লাহর বিশ্বস্ত অনুচর হিসেবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিজেকে নিয়োজিত করেন। ইসলামে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর প্রথম দায়িত্ব হয় ইসলামের বিরুদ্ধে যেখানে যা কিছু লেখা আছে সেগুলোকে খণ্ডন করা এবং সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত হিন্দু এবং মুসলমান খ্রিস্টান যাজকদের ধোঁকায় খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল ইসলামের প্রতি তাদের আকৃষ্ট করে তোলা। তাঁর এই গ্রন্থটির নাম “ইসলামের সত্যতা সম্বন্ধে বড় ধর্মাবলম্বীদের মন্তব্য”। এই গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে। মুন্সী জমিরুদ্দীন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে জন জমিরুদ্দীন নামে পরিচিত হয়েছিলেন, পরে ইসলামে প্রত্যাবর্তন করে তিনি আবার মুন্সী জমিরুদ্দীন হিসেবে ফিরে এলেন।

মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ “রদ্দে খ্রীস্টীয়ান ও দলিলুল এসলাম” নামে একটি রচনা করেছিলেন। একসময় মুসলমান সমাজের উপর এর প্রভাব ছিল অপরিসীম। গ্রন্থটি খ্রিস্টান পাদ্রীদের আক্রমণের পাল্টা জবাবস্বরূপ লিখিত হয়েছিল। গ্রন্থটিতে মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর প্রগাঢ় ধর্মজ্ঞান ও বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে। খ্রিস্টান ধর্মের বিরুদ্ধে তাঁর অন্য একটি গ্রন্থের নাম “খ্রিস্টীয় ধর্মের অসারতা”। এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে। সেসময় অর্থাৎ ইংরেজ শাসনামলে কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে আক্রমণ করা বৃটিশ আইন বিরোধী ছিল। সে কারণে মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহকে নানাবিধ পরীক্ষা-নীরিক্ষার মাধ্যমে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছিল। তাঁর যুক্তি এত অকাট্য ছিল সে সময়কার খ্রিস্টীয় সমাজ এ গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করবার জন্য বৃটিশ সরকারের নিকট কোনোরূপ আবেদন জানায়নি। আরেকটি কথা এক্ষেত্রে মনে রাখা ভাল যে, তৎকালীন খ্রিস্টীয় সমাজ নিজেদের প্রবল অহমিকায় মুসলমান এবং হিন্দুদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে নেমে পড়তে দ্বিধা করত না। খ্রিস্টান পাদ্রীরা কুরআন শরীফ এবং হাদীস শরীফ থেকে নানাবিদ উদ্ধৃতি দিয়ে সেগুলোর অবাস্তবতা প্রমাণ করবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু তারা যখন মুন্সী মেহেরুল্লাহর সম্মুখীন হল তখন তারা বুঝতে পারল যে এর সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব নয়।

একদিন রাজা রামমোহন রায় যেভাবে পাদ্রীদের যুক্তি খণ্ডন করে বেদোক্ত হিন্দুধর্মের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তেমনি মুন্সী মেহেরুল্লাহ এবং তাঁর সহচর মুন্সী জমিরুদ্দীন খ্রিস্টীয় ধর্মের অসারতা প্রমাণ করেছিলেন এবং ইসলামের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ রচিত গ্রন্থগুলোর নামঃ ১. খ্রিস্টীয় ধর্মের অসারতা [১৮৮৬]; ২. মেহেরুল ইসলাম [১৮৯৭]; ৩. বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ ভাণ্ডার [৩য় সং ১৯০০]; ৪. পান্দেনামা [২য় সং ১৯০৮]; ৫. হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা [১৮৯৬]; ৬. খ্রীস্টান মুসলমান তর্কযুদ্ধ; ৭. রদ্দে খ্রীস্টিয়ান ও দলিলুল এসলাম [১৮৯৫]; ৮. বাবু ঈশানচন্দ্র মণ্ডল এবং চার্লস ফ্রেঞ্চের “এসলাম গ্রহণ”; ৯. শ্লোকমালা।

মুসলমান সমাজের সংস্কারের উদ্দেশ্য নিয়ে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ “মেহরুল ইসলাম” নামক একটি দোভাষী পুঁথি কাব্য রচনা করেন। এই পুঁথির শুরুতে রসূলে করিমের উদ্দেশ্যে একটি দীর্ঘ প্রশস্তি বা না’ত আছে। যদিও আজকালকার দিনে অনেকে জানেন না যে, এ না’তটি কে রচনা করেছিলেন। কিন্তু যেখানে মিলাদ মাহফিলে গ্রামাঞ্চলে এই না’তটি গাওয়া হয়ে থাকে। এ না’তের এক জয়গায় আছে:

গাওরে মছলেমগণ, নবীগুণ গাওরে।।

পরাণ ভরিয়া সবে ছল্লে 'আলা গাওরে।

তবে যেটা বর্তমানে হয়েছে তাহল মুন্সী মেহেরুল্লাহ রচনা মীর মশাররফ হোসেনের না’তের মধ্যে মিশে গেছে এবং একেবারে

বর্তমানে এসে গোলাম মোস্তফা রচিত দরুদের মধ্যে মিশে গেছে। এতেই বোঝা যায় যে, মুন্সী মেহেরুল্লাহর প্রভাব কতটা ছিল এবং এখনো কতটা আছে। এ গ্রন্থের ভাষা অত্যন্ত সহজ এবং শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর মানুষই উপভোগ করতে পারবে। গ্রন্থের ভাষায় লালিত্য এবং মাধুর্য আছে।

মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ বিখ্যাত হয়ে থাকবেন খ্রিস্টান ধর্মের কবল থেকে বাঙালী মুসলমানকে রক্ষা করবার আপ্রাণ চেষ্টার জন্য। ইউরোপে দীর্ঘদিন ধরে খ্রিস্টান পাদ্রীগণ ইউরোপীয় জনসাধারণের কাছে ইসলামের অপব্যাখ্যা করে আসছিল। ইসলামের বিরুদ্ধে তারা অনেক কাহিনী নির্মাণ করেছিল। এ সমস্ত কাহিনী খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের লোকেরা এত গভীরভাবে বিশ্বাস করতো যে তাদের ধারণা জন্মেছিল যে কুরআন শরীফ হচ্ছে শয়তানের রচনা [নাউযুবিল্লাহ্]। যেসব খ্রিস্টান পাদ্রী খ্রিস্টধর্ম প্রচার করতে ভারতবর্ষ তথা বঙ্গভূমিতে এসেছিল তারা পাশ্চাত্যের নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামকে আক্রমণ আরম্ভ করেছিল। তাদের আক্রমণের প্রথম যথাযথ প্রত্যুত্তর মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ দিয়েছিলেন। তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন মুন্সী জমীরুদ্দীন। ইসলামকে যথার্থরূপে এদেশের মানুষের সামনে উপস্থিত করে তাঁরা যে আদর্শ স্থাপন করে গিয়েছেন তার তুলনা হয় না। এঁদের উভয়ের কীর্তি কোনোক্রমে খর্ব করে দেখা উচিৎ নয়। এঁদের বিত্ত ছিল না, জনবল ছিল না, কিন্তু ইসলামের প্রতি নিষ্ঠা এবং অগাধ বিশ্বাস ছিল। শুধু এই বিশ্বাসকে অবলম্বন করে তাঁরা সে যুগে একটি অসাধ্য সাধন করেছিল। এ ইতিহাস বর্তমান প্রজন্মের মানুষকে নতুন করে জানতে হবে।

সূত্রঃ প্রেক্ষণ, মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ স্মরণ সংখ্যা

সৈয়দ আলী আহসান

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক ইতিহাসবেত্তা ও শিল্প সচেতন ব্যক্তিত্ব সৈয়দ আলী আহসান ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ২২ মার্চ যশোর জেলার মাগুরার (বর্তমান জেলা) আলোকদিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বরেণ্য তাপস হযরত শাহ আলী বোগদাদীর বংশধর। সৈয়দ আলী আহসানের পূর্ব পুরুষেরা অনেকেই ধর্মপ্রাণ ও জ্ঞানবান মনীষী ছিলেন।

সৈয়দ আলী আহসানের শিক্ষা জীবনের শুরু ঢাকার ধামরাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। কিন্তু প্রকৃত পাঠচর্চা চলতে থাকে গৃহাঙ্গনে। গৃহ শিক্ষকের কাছ থেকে তিনি ফারসী, ইংরেজী, বাংলা ও গণিত শাস্ত্রে পাঠ গ্রহণ করতে থাকেন। ১৯৪০ সালে সৈয়দ আলী আহসানের বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শুরু হয়। ১৯৪৪ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী - ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ ডিগ্রী লাভ করেন।

তাঁর কর্মজীবন হুগলী ইসলামিয়া ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক (১৯৪৫) হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। এরপর প্রোগ্রাম এ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে অল-ইন্ডিয়া রেডিও, ঢাকা রেডিও (১৯৪৭)। ১৯৪৯ সালে সাহিত্য কর্মের খ্যাতির জন্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক পদে নিয়োগ করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি আন্তর্জাতিক পি. ই. এন. পাকিস্তান শাখার সেক্রেটারী জেনারেল নিযুক্ত হন। ১৯৬০ সালে তিনি বাংলা একাডেমীর পরিচালকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৬৭ সালে সৈয়দ আলী আহসান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন।

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে অংশ নেন এবং ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দে সৈয়দ আলী আহসান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দসৈনিক হিসেবে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। এ সময় তিনি "চেনাকণ্ঠ" ছদ্মনামে পরিচিত ছিলেন।

স্বাধীনতার পর ১৯৭৭-৭৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ক্রীড়া ও ধর্ম সম্পর্কিত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৭৫ সালে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে নিয়েগ পান। সুইডেনের নোবেল কমিটির সাহিত্য শাখার উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেন ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি জাতীয় অধ্যাপক হিসাবে অভিষিক্ত হন এবং সে বছরই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। শেষ বয়সে দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটির উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে প্রফেসর হিসেবে যোগ দেন। ১৯৫৪ সালে তিনি করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ পান। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

আর্মানিটোলা বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণীতে পড়ার সময় ১৯৩৭ সালে স্কুল ম্যাগাজিনে তাঁর প্রথম একটি ইংরেজী কবিতা "The rose" প্রথম মুদ্রিত হয়। কবি মতিউল ইসলাম এ কবিতাটি বাঙলায় অনুবাদ করে “চাবুক” পত্রিকায় প্রকাশ করেন। ম্যাট্রিক পড়ার সময় “আজাদ” পত্রিকায় তাঁর দু’টি লেখা প্রকাশিত হয়। একটির শিরোনাম “হিন্দু-মুসলিম সমস্যা” এবং অন্যটি “গণতন্ত্র ও ডিকটেটরশীপ।”

এই তরুণ বয়সেই সাহিত্য কর্মের জন্যে তৎকালীন বাংলা ভাষার খ্যাতিমান কবি সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর সখ্যতা গড়ে উঠে। এ সকল কবি সাহিত্যিকের মধ্যে কবি ফররুখ আহমদ, সিকান্দার আবুজাফর, শওকত ওসমান, বেগম সুফিয়া কামাল, হুমায়ুন কবীর প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগে পড়ার সময় সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চায় এবং কথা বলার অসাধারণ কলাকৌশলের জন্যে সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় তিনি “প্রগতি সাহিত্য সংসদ” ও রেডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি’র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

১৯৪০ থেকে ৪৪ এর মধ্যে তিনি গল্প লিখতে শুরু করেন। “মাসিক মোহাম্মদী” এবং “সওগাত” পত্রিকায় তাঁর বেশ কয়েকটি গল্প প্রকাশিত হয়। “বুদ্বুদ”, “তারা তিনজন”, “রহিমা”, “জন্মদিনে” গল্পগুলি তাঁর অন্যতম। এ সময় তিনি “ইহাই স্বাভাবিক নামে একটি উপন্যাসও লিখেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে গল্পচর্চা ছেড়ে শুরু করেন কবিতা চর্চা। সমালোচক হিসেবে তাঁর পদার্পণ ঘটে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের “পরিচয়” পত্রিকায়, কবি সত্যেন্দ্রনাথ শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধটি মুদ্রিত হবার পর। এ সময়ে লেখা “রোহিনী”, “কবিতার বিষয়বস্তু” ও “কালি কলমের প্রথম বর্ষ” প্রবন্ধ তিনটি সওগাত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

সৈয়দ আলী আহসানের সম্পাদনায় ১৯৫০ সালে শাহাদৎ হোসেনের কাব্য সংকলন “রূপছন্দা” প্রকাশিত হয়। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে অংশ নেন- এ সময় তিনি “ইকবালের কবিতা” সম্পাদনা করেন। ১৯৫৩ সালে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুলস্নাহর সহযোগে “গল্পসঞ্চয়ন” নামে একটি গল্প সংকলন সম্পাদনা করেন। ১৯৫৪ সালে “নজরুল ইসলাম” নামক একটি সমালোচনা গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৯৫৬ সালে মুহম্মদ আবদুল হাই এর সহযোগিতায় “বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত” গ্রন্থটি রচনা করেন। করাচী থাকাকালীন “কবি মধুসূদন” নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

সৈয়দ আলী আহসানের প্রতিভা বিভিন্নমুখী। প্রবন্ধলেখা ও সমালোচনায় তাঁর কৃতিত্ব তুলনাহীন। “কবিতার কথা ও অন্যান্য বিবেচনা” গ্রন্থে অসাধারণ দক্ষতায় প্রবন্ধ ও সমালোচনাকে তিনি সৃষ্টিশীল করে তুলেছেন।

তাঁর “অনেক আকাশ”, “একক সন্ধ্যায় বসন্ত”, “সহসা সচকিত” এবং “আমার প্রতিদিনের শব্দ” কাব্যগ্রন্থগুলো ঐতিহ্যানুরাগী সৌন্দর্যবোধ ও দেশপ্রীতির অনুপম নিদর্শন।

সৈয়দ আলী আহসানের চিত্রকলা, সঙ্গীত এবং অন্যান্য চারুকলার প্রতি আগ্রহ অপরিসীম। চিত্রকলার ইতিহাস ও চিত্রশিল্পের রসাস্বাদনে তিনি একজন নিবেদিত প্রাণ। চিত্রকলার অধ্যাপনায় তাঁর সাফল্য বিশেষ স্মরণীয়। ১৯৭০ সালে তাঁর “আধুনিক বাংলা কবিতাঃ শব্দের অনুষঙ্গে” প্রকাশিত হয়।

১৯৭৩ সালে তাঁর সম্পাদিত মধ্যযুগের কাব্য “মধুমালতি” প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থেও তাঁর পান্ডিত্যের পরিচয় রয়েছে। ১৯৪৭ সালে “রবীন্দ্রনাথঃ কাব্য বিচারে ভূমিকা” গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ১৯৭৬ সালে “জার্মান সাহিত্য; একটি নিদর্শন” প্রকাশিত হয়।

১৯৮২ সালে "Approach" নামে একটি ইংরেজী ষান্মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ১৯৮৬ সালে তাঁর “আধুনিক কাব্য চৈতন্য এবং মোহাম্মদ মানিরুজ্জামানের কবিতা” শীর্ষক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়।

এই জ্ঞানতাপস সৈয়দ আলী আহসান ২০০২ সালের ২৫ জুলাই বৃহস্পতিবার ঢাকার ধানমন্ডির কলাবাগানস্থ নিজ বাসভবনে পরলোক গমন করেন।